বাংলার কাশিল্প সমসাময়িক অবস্থান

অমিত গুপ্ত

বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে কুটীরশিল্পীদের বসবাস। এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন চোখে না পড়লেও, শিল্পচর্চার গুণগত উৎকর্ষ রক্ষা করার প্রয়াস এঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। বংশপরম্পরায় এইসব কাশিল্পীরা আমাদের সাংস্কৃতিক সমাজজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার গ্রামে গ্রামে অত্যন্ত সাধারণ মানের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে এঁরা নিজেদের শিল্পচর্চা অটুট রেখেছেন।

মানুষের চির পট পরিবর্তন ঘটছে। বিত্ত ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই চি বির্বতনের ধারা লক্ষ করা যায়। ঝাড়লণ্ঠনের পাশাপাশি চিত্রকরের পট বা বাঁধানো ছবি বিত্ত বা মধবিত্তের ঘরের দেয়ালে এখন শোভা পাচ্ছে। বিভিন্ন কাশিল্প মানুষের সমাজজীবনে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। সুস্থ চি ও বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়। সুস্থ সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করে। মনের অবচেতনায় আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মৌলিক সুপ্ত উপাদানগুলির বিকাশ ঘটায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপাসনা ও আত্ম-উপলব্ধির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই মানসিক বিনোদনের প্রয়াস একান্ত জরি। সমাজ-সংসারে এর অভাব দেখা দিলে স্নায়ু ও মানসিক অস্থিরতা বাড়ে। শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এখানেই।

কাশিল্প বা কারিগরি শিল্পের বিভিন্ন ধারা আছে। এই সামান্য পরিসরে হয়তো সব শিল্পের কথা লেখা যাবে না। তবুও ব্যক্তিজীবনে আমার সন্ধান ও অভিজ্ঞতার একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এখানে।

গ্রাম বাংলার অবলুপ্ত-প্রায় এক শিল্প 'পালকি' বা 'শিবিকা'। পালকির প্রাচীন রূপ ছিল 'ডুলি'। এখনও ওড়িশা কিংবা উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে ডুলি দেখতে পাওয়া যায়। মুঘল রাজাদের সময়ে হাতির পিঠে সুসজ্জিত ঘর চলাচলের জন্য ব্যবহার হতো, যার নাম 'তানজাম'। এইসব ঘরের রূপসজ্জার সঙ্গে পালকির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তানজাম-এর চারদিক কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকত, কিন্তু পালকিতে সবটুকুই কাঠের তৈরি। পালকির দুপাশে দুটো দরজা থাকে। কাঠের পায়ে এবং দরজায় নানারকম খোদাই করা লতাপাতা ও ফুলের নকশা দেখা যায়। কোনো কোনো পালকির ওপরে সিল্ক কাপড়ের ঝালর থাকে। নবাবদের পরিবারে তানজাম যেমন ছিল এক সম্মানের প্রতীক, তেমনি বাংলার অভিজাত পরিবারে পালকি হলো এক মর্যাদার যান। ১৯৮৭ সালে বীরভূম জেলায় এরকমই একটি গ্রামে যাই। সিউড়ি থেকে দু কিলোমিটার দূরে। গ্রামের নাম 'কড্ডে', যার ভালো নাম 'কড়িঠ্যা'। এখানে শিবিকা বা পালকি শিল্পীদের সঙ্গে দেখা হয়। তখন এই গ্রামের জনবসতি ছিল প্রায় দু-হাজারের মত। লোকযানের প্রাচীন নিদর্শন এই গ্রামটি। কড্ডে গ্রামে এসে দেখা হলো এই শিল্পী পরিবারের মহাদেব শর্মার সঙ্গে। এঁর পরিবারের পূর্বপুষেরা এই শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন। এই পরিবারে রামরতন শর্মা আর বিনোদ শর্মার নাম উল্লেখ্য। বাংলার শিবিকা-শিল্পে রামরতন শর্মাকে এক কিংবদন্তী পুষ বলা যায়। শিল্প-কুশলতায় এঁর কাজ ছিল অনন্য। ইনি মহাদেব শর্মার দাদু। মারা গেছেন ১৯৭৪ সালে। এই শিল্পীর উত্তরপুষ, মহাদেব শর্মা এই বাড়ির উঠোনে রাখা অতীত দিনের তৈরি কাঠের কাজগুলো ঘুরে ঘুরে দেখালেন। তিনি জানালেন, যে শিল্পী যত উন্নতমানের হালকা কাঠের পালকি তৈরি করতে পারত, সে তত বড় শিল্পী। ভালো মানের কাঠ আসত উত্তরবঙ্গ থেকে। সেগুলো পাইন বা ওক্ গাছের কাঠ। যত কম ওজনের পালকি হবে, তত ভালো মানের। কদরও তার বেশি। ভালো ওজনের পালকি বলতে আঠারো সেরি পালকি। মহাদেব বললেন, তার পর বাইশ সেরি বা তেত্রিশ সেরি পালকি তো আছেই। একটা পালকির সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম এর দরজা ঠেলা-পাল্লায় তৈরি। মহাদেবের মতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ওঁদের পালকিগুলো ভাড়া হতো মোটামুটি। এখন চাহিদা একদম কমে গেছে। আগে এই পালকি ভাড়া নিতে আসত বিভিন্ন গ্রাম থেকে। যেমন—ঝরামাঠ, পাতাডাঙ্গা, কামালপুর, লম্বোদরপুর, জীবনধরপুর, গোবিন্দপুর, ধৈটো—আরও কত দূর দূরান্ত থেকে। এই যান বহন করত আটজন বাহক আর সামনে থাকত একজন সর্দার। সর্দারের হাতে থাকত একটা মোটা বাঁশের লাঠি। বাঁশের ওপরটা পেতল দিয়ে বাঁধানো। পালকির সামনে ও পেছনে কাঠের পাটা কাঁধে নিয়ে সর্দারের নির্দেশমত পথ চলত। সামনের দিকে যারা থাকত, তারা বুলি বা ছড়া কাটতে। সামনে গাঁড়া সামলে/ঘুরবে এবার সামলে।' পেছনের বাহকেরা তখন উত্তর দিত 'হুন্না বা হুহুন্না', মানে শুনেছি। এই কড়িঠ্যা গ্রামের পালকিগুলো বইত কুলেড়া, কেঁদুয়া বা বাতিকর গ্রামের বাহকেরা। সিউড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে এই কুলেড়া গ্রাম। পথের পাশে একটা বড় দিঘি। নাম দত্তপুকুর। পুকুরের সামনে একটা প্রবেশদ্বার দেখতে পেলাম। তার গায়ে লেখা 'শিব চরণাশ্রিত ভক্ত শ্রী জীবনচন্দ্র দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন ১৩০৭ সাল।' প্রবেশদ্বারের ওপর একটা নহবতখানা, সামনে শিব-এর মূর্তি। দুপাশে সিংহ ও গুর প্রতিকৃতি। পুকুর পেরিয়ে আরও কিছুটা পথ হেঁটে এলাম কুলেড়া গ্রামে। এখন সকাল পেরিয়ে প্রায় দুপুর। এখানেই দেখলাম হেমাই, খান্দা, ধনদাস, পঞ্চা, জপু, বিশু, হারা ও শঙ্করের ঘর। এঁরা সবাই পালকি বাহক। এঁদের আগের পুষরাও এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের কাছেই বিদাসি বাহকের খ্যাতি শুনলাম। এই অঞ্চলের কালু, পাতু বা সোনাই—এঁদের নামও প্রাচীন বাহক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের পূর্বপুষেরা এসেছিলেন দক্ষিণ ভারত থেকে। এঁরা গ্রাম--দেবতার পুজো করেন। এঁদের নাচ-গান, বিবাহ স্বতন্ত্র। পুষ ও নারী উভয়েই খুব কর্মঠ এবং এঁদের ছেলেমেয়ে বা সন্তানের সংখ্যা কম। হেমাইয়ের ভালো নাম হেমন্ত। ওঁর ঘরে গেলাম । ঘরের কোণে একটা ছাতা ও পলুই ঝুলছে। একপাশে পারোলে কচু ছড়ানো। হাওয়ায় শুকোচ্ছে। ঘরের ভেতর বাঁদরা, লক্ষ্মী, কৃষ্ণা আর শিবের মূর্তি। মাটির চেলানো বা হাঁড়িতে রাখা আছে চাল। বেতের খাঁচিতে ধান ভর্তি। পাশে পেতলের একটা কলসি আর হাটা বা কুলো। দরজার কড়িকাঠে ঘোড়ার একটা ক্ষুর ঝুলছে। ওঁদের ঝিাস, এই 'লওয়া' ঘরে থাকলে শনির আকর্ষণ পড়ে না।

হেমাই বলল ‘এখান থেকে ফুল্লারপুর ভাড়া নিতাম তখন যাতায়াতে আশি টাকা। যে সময়টু বলছি, তখন লোকের মজুরি ছিল দেড়টাকা, সকাল সাতটা-আটটায় খেয়েদেয়ে রওনা হতুম আর ফিরতুম তার পরের দিন। লগ্নদৃষ্টি হবার পর। কাঁধ পালটে আটজন করে বইতুম। দলে থাকত বারোজন। সে যেন এক যাত্রার দল। আগের লোক বুলি কাটত, পেছনের লোক সামলে নিত। লগ্ন হিসেবে মাসে দুটো বা চারটে ভাড়া হতো। তা ধরেন, বাইশ-চব্বিশ বা সাতাশে। ফাল্গুন থেকে আষাঢ় পর্যন্ত। ভাদ্র বা চৈত্র মাসে মুসলমানদের ভাড়া হতো। এখন তেমন আর কই ? তাই এখন জন খাটি।’

জানা যায়, ঠাকুর পরিবার, ডেভিড হেয়ার সাহেব, ভিভিয়ান লুই ডিরাজিও, বিদ্যাসাগর মশায়, রাজা রামমোহন রায়—এঁদের সবারই নিজস্ব পালকি ছিল। ব্রিটিশ শাসনের সময় ছোট লাট এবং বড়লাট সাহেবদের জন্য যে পালকি ব্যবহার হত, তাতে বাহকের সংখ্যা ছিল চৌষট্টি জন। আর বিদ্যাসাগর মশায়ের বাহক ছিল ষোলো জন। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ও পালকি ব্যবহার করতেন। আগেকার সময়ে সম্ভ্রান্ত ঘরের অনেক মহিলারা পালকিতে বসে গঙ্গাতে স্নান করতে যেতেন। পালকিতে বসেই গঙ্গায় ডুব দিতেন। সেইসব পালকির গড়ন ছিল আলাদা। পালকির পাটাতন তৈরি হত বেত দিয়ে। যাতে জলে ক্ষতি না হয় বা সহজে জল বেরিয়ে যেতে পারে বেতের পাটাতন দিয়ে।

এক সময়ে যাঁদের পেশা ছিল শুধু পালকি বহন করা, এখন তাঁরা কেউ কেউ কৃষিজীবী, কেউ কেউ শ্রম-মজুর। জনযট আর দ্রুতযানের সমাজে এখন আর সেই মানুষ-নির্ভর যানের কদর কোথায়। তাছাড়া ভূমিভিত্তিক সমাজেরও রূপান্তরের ফলে পালকির বাহকদের মূল্যায়ন কমেছে। নব্য শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থায় ম ানুষের চি যেমন পাল্টাচ্ছে, তেমনই এই শিল্পচর্চার তাগিদও কমছে। তবুও মানুষের আধুনিকতা ও চির অন্তরালে পুরানো বা চিরায়ত সংস্কৃতিকে নতুন করে উপভে াগ করার প্রয়াস থেকেই যায়। এটাই ইতিহাসের নিয়ম। ফলে, আবার পালকিকে শহরের পথে দেখা গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিবিকা বা পালকি শিল্পের মতন বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় এবং লোকপ্রিয় শিল্প পটুয়াদের পটচিত্র। এই পটচিত্র এখন স্বদেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও খুব জনপ্রিয়। যদিও এইসব চিত্রের বিষয়বস্তু ও গান বা কাহিনীর রূপান্তর ঘটছে, তবুও চিত্রকরেরা তাঁদের শিল্পসত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই বিবর্তনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। বিভিন্ন মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবে এই চিত্রকরেরা ওঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে উপস্থিত থাকে এবং কেনাবেচাও হয়। দূরদর্শনের মাধ্যমে এই শিল্পের প্রচার লক্ষ করা য ায়। সরকারি এবং বেসরকারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই শিল্পীরা আমন্ত্রণ পান। বাংলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখেছি, মূলত এই চিত্রকরেরা মুসলমান কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেরই একটা হিন্দু নাম আছে। যেমন, মহম্মদ হোসেন চিত্রকরের নাম লাল্টু, রহমদ চিত্রকরের নাম নিতাই; এ রকম রাঢ় অঞ্চলের অনেক চিত্রকরের নাম দ্বিজপদ, ভক্তি বাস, খাঁদা। এরা জাতিতে মুসলমান। কিন্তু কঠোর ইসলামি ধর্ম মেনে চলা এঁদের স্বভাব নয়। এঁদের শিল্পকলা বা জি-রোজগার—হিন্দু দেবদেবী, মিথ এবং পুরাণ কাহিনী অবলম্বন করে । ধর্ম নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময় ও সুযোগ এদের কম।

সিউড়ি-সাঁইথিয়া বাস রাস্তার ওপর ইটগেড়িয়া, বীরভূমের সদর সিউড়ি থেকে পাঁচ মাইল। সাঁইথিয়া রেল স্টেশন থেকে ছ’মাইল। ১৯৮৩ সালে আমি এই গ্রামে এসেছিলাম। তখন পাকা রাস্তা ছুঁয়ে গ্রামে ঢুকতে হত মেঠো পথে। বাঁ হাতে ইস্কুল বাড়ি। ডান হাতে ঝুপির চা-দোকান। এখানেই ফকির চিত্রকর ভোরে চা খেতে অ াসতেন। তারপর রং-এর কাজে বেরোতেন। কখনো সিউড়ি, কখনো বা অন্যত্র। এই চিত্রকর তখন বাড়ির দালানে, মন্দিরের অঙ্গনে নানা ছবি ও নকশা আঁকতেন। পটের কাজের পাশাপাশি এই চিত্রকর তখন থেকেই দালান-চিত্রের কাজ শু করেছেন। চায়ের দোকানি বলল, ‘ফকির ভাল শিল্পী বটে। কত বাবু আসে, ওকে ডেকে লিয়ে যায় শহরে। ভাল ভাল পুরাতন ছবি গড়ে। কাজে মাস্টার কারিগর।

—কী লিবেন বাবু, ছবি না চিত্রকর।’ বললাম, গ্রামটা একটু ঘুরে দেখতাম। চিত্রকরদের সঙ্গে আলাপ করতাম। ‘যান ক্যনে’ গ্রামের উত্তর ধারে তালবাগান পেরিয়ে চিত্রকরদের ঘর। ‘জলিল লাই তো। উর বেটা কামাল আছে।’ গ্রামের শেষ প্রান্তে জলিল চিত্রকরের ঘর। ওর ছেলে কামালের সঙ্গে দেখা হলো। কামাল বলল, আববা কাজে বেরিয়েছে প্যাটেল নগরে। কামালের ঘর পেরিয়ে এলাম লাল্টু চিত্রকরের ঘর। লাল মাটির পোক্ত বাড়ি। পুর্ব-পশ্চিমে দুটো ঘর। মাঝখানে লম্বা দ াওয়া। উত্তর ধারে তালবাগান আর পুকুর। লাল্টুর ভাল নাম মহম্মদ হোসেন। গ্রামে গ্রামে ও পট নাচায়। বলল, সারাদিন পট লাচিয়ে আট-দশ পাই চাল পাই। দু ট াকা থেকে পাঁচ টাকা জগার হয় দিনে। আমি তো ডাঙর লই যে কাজ পাব। এতদিনে লাল্টু চিত্রকর হয়তো ডাঙর হয়ে গেছে। অন্য কোনো পেশায় হয়ত রয়েছে। তখন ওর বয়স ছিল তেরো বছর। বলল, একটা কাহিনী আঁকতে সময় লাগে বিশ দিন থেকে এক মাস। ভাল গড়তে তা প্রায় তিনমাস লাগে। আমরা বসেছিলাম উঠোনের ছায়াতে। মুখোমুখি রোদে বসে লাল্টু বাঁশের তৈরি ছোট একটা চৌকির ওপর পট রেখে বাঁ হাত দিয়ে গুটোতে গুটোতে গান ধরল। বলল, এটা গর পট। ওর চোখে মুখে তখন সকালের সরল রোদ পড়েছে। কপালের ওপর চুলগুলো সরিয়ে নিয়ে ভু বাঁকিয়ে গানের সুরে কাহিনী বলল—

ঘরে যার গ লাইগো ব্যথারই জীবন
আট চৌষট্টি ভগবতী জগতে জননী
সকাল বেলায় ছড় ঝাঁটি সন্ধ্যাবেলায় বাতি
তার ঘরে বিরাজ করেন লক্ষ্মী-ভগবতী।
সুনজর দিয়ে যে জন গোয়াল করিবে
গঙ্গা স্নানে ফল দেবে ঘরে বৈঠা পাবে।
কড়কড়ে কলাই ভাজা গইলে বসে খায়
গর গায়ে গুটিগুটি বসন্ত যে হয়।।
চারকুল ঝেঁটিয়ে মাগো ঈশান কোণে দেবে
গর মুখ দিয়ে মাগো গুচ্ছার উঠে গ মারা যাবে।
ভরিনি দুপুর বেলা ঢেঁকি জাঁতা পাড়ে
ঘরের লক্ষ্মী মাগো চুমকিয়া উঠে।

এইগুলি হচ্ছে মাগো গরই পালন
আর কিছু শুনতে চাও গো সাত বউয়ের বিবরণ।
আরও একটি বউ ছিলো সাঙ্গেরই ডিগর
গোলা করিতে পারবো না গো নিকবো না ঘর।
আরও বউ ছিলো নাম তার উমা—
গোলা করিবার নাম শুনিলে গায়ে লাগায় ধুমা।
আরও একটি বউ ছিলো রেতে খেত হাড়ি
বড় বউটি বলছে আমার গায়ে আইছে জ্বর
ছোট বউটি চালের বাত্তা ধরে নাড়িতে লাগিল
ভালোই হলো গেরস্থালীর পাল ঘুঁচে চলে গেল।
গেইচি লালবতী আমি দুই দুঃখ সঙ্গে
ঝম্পট মেরে লম্পট দিলে বড় ভাসুরের ঘাড়ে।
আজ এই সমাজে বড় বউ কুলেরই নন্দন
রিমঝিম করে বউমা গইলে দিল পা
খিচ গোবুর দেখে বউমা কপালে মারে ঘা।
সু-বুদ্ধির বউটি আমার কু-বুদ্ধি ঘটিল
উলটো ঝাঁটার বাড়ি গাভীকে মারিল।
পাঁচ মাসের গর্ভ ছিল খসিয়া পড়িল
কাঁদিতে কাঁদিতে পাল অন্য ধারে গেল।
বছরে বছরে পাল বাড়িতে লাগিল।।

গানের শেষে উপস্থিত মেয়েরা দূর থেকে প্রণাম সেরে নিল। পট গুটিয়ে প্রণাম করে লাল্টু চিত্রকর উঠে জল খেলো। আমরা বিড়ি ধরালাম। সিউড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে পানুরিয়া গ্রাম। এই গ্রামেও আশির দশকে ১৫-১৬ ঘর চিত্রকরদের বসবাস দেখা গেছে। পাড়ার নাম পোটোপাড়া। এঁদের পূর্বপুষেরা মাটির মূর্তি গড়তেন। এঁরা 'যমপট'-এ বিশেষ পারদর্শী। এই গ্রামে ভক্তি ও ছবিলাল চিত্রকরের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে দেখা হলো জলিল চিত্রকরের সঙ্গে। ১৯২৯-৩০ স ালে গুসদয় দত্ত এই গ্রামে এসেছিলেন। ১৯৫৪-৫৫-তে বিনয় ঘোষ ইটাগড়িয়া গ্রামে এসেছিলেন। বিনয় ঘোষের মুখেই এই গ্রামে সুদর্শন চিত্রকরের নাম জানতে পারি। এইসব চিত্রকরদের পরিবার ও বংশের লোকেরা ছড়িয়ে আছেন বাংলোর বিভিন্ন গ্রামে। কানাচি, আয়াস, ষাটপলসা, ঝাউপাড়া, রামপুরহাট। মুর্শিদাবাদের কাতুরহাট। বর্ধমান জেলায় ভুরি, সাঁকরাই প্রভৃতি জায়গায়। বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ছাড়াও চিত্রকরদের বসবাস দেখা যায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুলিয়া ও দক্ষিণ চবিবশ পরগণায়। বাঁকুড়া ও পুলিয়া অঞ্চলে এঁরা 'পাটিদার' নামেও পরিচিত। খড়গপুর স্টেশনে নেমে বাসে যেতে হয় 'নয়াগ্রামে'। মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত এই নয়া গ্রাম। এখানেও বেশ কিছু চিত্রকরদের বসবাস। নয়া গ্রাম-এ সবচেয়ে প্রবীণ চিত্রকর—পুলিন চিত্রকর। এঁর বয়স ৮০-এর ওপরে। এঁর জামাই রঞ্জিত চিত্রকর এই গ্রামেই থাকেন। তাছাড়া যাটোর্ধব দুঃখশ্যাম চিত্রকর বিশেষ পরিচিত। এখানেই বিষ্ণুপদ চিত্রকরের ঘর। নয়াগ্রামে মহিলা চিত্রকর অ াছেন স্বর্ণ চিত্রকর। পূর্ব মেদিনীপুরে 'নামকার চেকের' ফুলজান, বিজয়, আজুমান চিত্রকরের নাম উল্লেখযোগ্য।

আগে পৌরাণিক দেব-দেবী, যমপট, যাদুপট বা চক্ষুদান পটের প্রচলন ছিল বেশি। সময়ের বিবর্তনে সমসাময়িক সামাজিক ও শিক্ষামূলক পটের প্রচলন বেড়েছে। সরকারের সহযোগিতায় নানান সাংস্কৃতিক কর্মশালায় পণপ্রথা, সাক্ষরতা, বৃক্ষরোপণ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, এড্স ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষামূলক পট এখন দেখা যায়। অ াগেকার পটের বিষয় ছিল হরিশচন্দ্র, মনসা, কৃষ্ণলীলা, যমদূত, সাহেব ইত্যাদি। আদিবাসীদের নানান দেব-দেবীও পটে স্থান পেয়েছে। চিত্রকরদের সমাজজীবনে অ াদিবাসীদের প্রভাব এর মূল কারণ। পুলিয়ার ঝালদা, বড়বাজার, মানবাজার, জয়পুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চিত্রকরদের সন্ধান মেলে। বাঁকুড়া জেলায় ভরতপুর, ছাতনা, শালতোড়া, কালিপাহাড়ী অঞ্চলে সাঁওতালদের বসবাস বেশি। চিত্রকর বা পটিদাররা সাঁওতালদের সমাজে যাজকের ভূমিকায় গণ্য। আদিবাসী পরিবারে কেউ মারা গেলে পটিদার 'চক্ষুদান' পট খেলায়। ভূত-প্রেত আর আত্মার কাহিনী নিয়ে এইসব চিত্রকর পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়। মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝায়। তাই আদিবাসীদের সমাজজীবনে এই পটিদার বা চিত্রকরের মূল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পটিদার বিষয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন—

The Patidar narrates the cause of death, which is always the case of malicious influence of a ghost or Demon or evil spirit, whether the death is due to disease or accident or even murder or suicide. During narration he mentions some 'goods' or 'things' which the dead man loved and now, after death, wish to possess. It may be any utensil, a bullock, a cow, a goat, or even a piece of land. The members of the family have to make a gift of the thing to the Patidar for the deliverence of the tortured soul of the dead'.

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পটিদার্রা তখনকার সময় অনেকটা ওঝাদের ভূমিকায় পটকে ব্যবহার করতেন।

এবার লক্ষণীয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পটের রং ব্যবহারের রূপান্তর। অতীতে এই পট তুলোট কাগজে আঁকা হতো কয়লার বা কাঠের ভূষি, টিথ ফুল বা অন্যান্য ভেষজ পাতা বেটে বা গুলে। এখন ব্যবহৃত হচ্ছে গুড়ো রং এবং পোস্টার রং। আঁকার শৈলী খুব একটা পরিবর্তন না হলেও, রঙের প্রকাশ ও ব্যবহার পাল্টেছে। পটের দাম মূলত নির্ভর করে পটের দৈর্ঘ্য বা আয়তন হিসেবে। দু দশক আগেও এক একটা পটের দাম ছিল ৫০—১০০ টাকা। এখন ২৫০—৬০০ টাকা।

ডোকরা বা পালকি শিল্পের মতই এই পটশিল্প ক্রমশ অবলুপ্ত হতে চলেছে। তাই এখন বেশিরভাগ চিত্রকরের পরিবারকে দেখা যায় চাষবাস বা দিনমজুরের কাজ করতে। তবুও বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও এই দরিদ্র চিত্রকরদের সন্ধান পাওয়া যায়। অভাব অনটন এবং নানান টানাপোড়েনের মধ্যেও এই সমাজে এঁরা বেঁচেবর্তে আছেন।

সমসাময়িক পটুয়ারা সামাজিক নানা বিষয়ের উপর গান বাঁধছেন। বনসৃজন, সাক্ষরতা, নারী নির্যাতন, পণপ্রথা ছাড়াও সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের টীকা বিভিন্ন বিষয়ে গান বাঁধেন এঁরা। এ বছর কলকাতায় 'আববাস মেলা' থেকে সংগ্রহ করা একটি গান—

'সরকার মোদের চায় না ক্ষতি
দিচ্ছে বিনামূল্যে ঔষধ-পাতি
পাস করো গো হেল্‌থ সেন্টার,
পোটো দিয়ে করো প্রচার।

এখনকার চিত্রকরেরা পট আঁকেন তুলোট কাগজের বদলে আর্ট-পেপারে। তলায় থাকে কাপড়ের স্তর। ঘটনা বা কাহিনীকে পরপর সাজিয়ে তৈরি হয় জড়ানো পট। একটা সময় কালীঘাটের পট খুব বিখ্যাত ছিল। দেশ-বিদেশের পট-রসিকরা কালীঘাটে আসতেন পট সংগ্রহে। সমসাময়িক পটুযারা যদিও নিজেদের এই শিল্প-পেশা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন অন্য পেশায়, শিশুদের বা ছোটদের শহরে পাঠাচ্ছেন লেখাপড়ার জন্য, তবুও পটুয়া-শিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন নিজেদের অস্তিত্ব এবং নিজস্বতাকে বাঁচিয়ে রাখতে। এই সামাজিক সচেতনতা, নিরক্ষর পটুয়াদের এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে এঁদের জীবনসংগ্রামে। তাই পটুয়াদের কণ্ঠে এখন শোনা যায় —

'পণ নিব না, পণ দিব না
এইটি শপথ কর
পণের কথা বললে রে ভাই
আগে থানায় চল,
চণ্ডীপুর থানা মোদের,
নানাকারচকে ঘর—
নারী-নির্যাতনের পট গান করি
আমরা চিত্রকর।'

যাঁরা পীরের দরগায় বানিয়ে দেন্ ঘোড়া আবার একই সাথে গেয়ে বেড়ান রামায়ণ গান, এই বৈপরীত্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধাই হয়তো এঁদের আলদা করেছে সামা জিক সঙ্কীর্ণতাবোধ থেকে। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকদের আঘাত করেছেন এঁরা।

বাংলার নারীশিল্পে কাঁথা শিল্পের চর্চা সুপ্রাচীন। কাঁথা শব্দ এসেছে সম্ভবত সংস্কৃত 'কন্থা' শব্দ থেকে। তবে এই শিল্পচর্চা যে বহুদিনের, তার নিদর্শন পাই বৌদ্ধ পালি ইতিহাস থেকে। কারণ দেখা গেছে বৌদ্ধ উপাসকেরা কাঁথার পোশাক ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে বাউল, ফকির, সুফি, গাজী ও পীর সম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যেও এই কাঁথার জোববা ব্যবহার করতে দেখা যায়। জানা যায়, অধুনা বাংলাদেশে কুমিল্লা জেলার ময়নামতীর রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হবার পর পুরনো কাঁথ ার উত্তরীয় ও ঝোলা ব্যবহার করতেন। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদিত 'গোপীচন্দ্রের গান'-এ এর উল্লেখ পাই।
'নাপিতে আনিয়া রাজার মাথা মুড়াইল।
মুখেতে খেউড় করি ভুসঙ্গ চড়াইল।।
বগলে বগলি দিল শৃঙ্গনাদ গলে।
রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিলেন কপালে।।
আবার বাউলদের গানেও এই কাঁথার কথা উল্লেখ আছে। মহম্মদ সহিদুরের 'নকশি কাঁথা' নিবন্ধ থেকে পাই—
'আসমান জোড়া ফকিরের ভাই
জমিন জোড়া কেয়া
এ সব ফকির মরলে পরে
এর কবর হবে কোথারে—'

আলপনার মধ্যে নারীমনের যেমন সুপ্ত শিল্পসত্তার প্রকাশ ঘটে, কাঁথা শিল্পের মধ্যেও এই সুপ্ত চেতনার প্রকাশ ঘটে। এই দুটো শিল্পই নারীমনের কল্পনা ও একাগ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বহুযুগ ধরে বাংলার গ্রামে গ্রামে এই কাশিল্পের বিকাশ দেখা যায়। এই শিল্পীরা কোনো শিক্ষালয়ে এসব শেখে না। বাড়ির মা, ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা বা স্থ ানীয় কোনো মহিলাদের কাছ থেকে এই শিক্ষা নেয়। পুরনো কাপড়ের টুকরো ভাঁজ বা পাট করে একটার উপর আরেকটা রেখে, চারপাশ আটকে কাঁথা সেলাই করে। আগেকার দিনে কাঠকয়লা বা কোনো গাছ থেকে রং দিয়ে পুরনো কাপড়ে নকশা বা বর্ডার আঁকা হতো। এরপর শাড়ি বা ধুতির পাড় থেকে বের করা রঙিন সুতো দিয়ে সেলাই করা হয় ফুল, লতাপাতা, পশুপাখি, মানুষ কিংবা নানা জ্যামিতিক নকশা। এই চিত্রণ বা মটিফের মাধ্যমে সাধারণ একটি কাঁথা রূপান্তরিত হয়

নকশি-কাঁথায়। নকশি কাঁথার বৈচিত্র্য হলো, এতে পাওয়া যায় সামাজিক, ধর্মীয় ও লোকজ উপকরণ। সাধারণত এই কাঁথা সেলাইয়ের মরশুম হলো বর্ষাকাল। এর কারণ হলো বর্ষাকালে গ্রামের মেয়েরা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বেরত না। ফলে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে অবসরে বাড়ির মেয়েরা কাঁথা সেলাই করতে বসে। বছরের অন্যসময়েও কাঁথা সেলাই হয় না এমন নয়। গ্রীষ্মকালে দাওয়ায় মাদুর বা পাটি বিছিয়ে বা শীতের দুপুরে রোদে পিঠ রেখেও কাঁথা সেলাই করা হয়। জানা যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধুনা বাংলাদেশের সিলেট্ জেলায় এরকম একটি কাঁথার সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই কাঁথাতে একটি মেয়ে ওর বিয়ে থেকে শু করে সারাজীবনের ঘটনা কাঁথার ওপর নিপুণভাবে সেলাই করেছিল।

এবার কাঁথা সেলাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। মেয়েরা সাধারণত হাঁটু মেলে বসে পায়ের বুড়ো আঙুলে সুতোকে জড়িয়ে দু-হাতে সুতোর প্যাঁচ দেয়। এইভাবে নানা রঙের সুতোকে হাতের চার আঙুলের মধ্যে একত্র করে পেঁচিয়ে রাখে। কাপড়ের নানা স্তরকে একটা মাদুর বা পরিষ্কার মেঝেতে বিছিয়ে খেজুর গাছের পাতার ধারালো কাঁটা দিয়ে কাপড়ের ভাজগুলো আটকানো হয় এবং কাঁথার কোণগুলো বেঁধে রাখা হয়, যাতে সেলাইয়ের সময় কাপড়ের স্তরগুলো নড়ে না যায়। বড় কাঁথা হলে কখনো দুজনে মিলে সেলাই করে। কাঁথা সেলাই করার সময় নানারকম ফোঁড় ব্যবহার করা হয়, যেমন—তেরছা ফোঁড়, বখেরা ফোঁড়, বেকি ফোঁড়, লিক ফোঁড়, বরফি ফোঁড়, বাঁশপাতা ফোঁড় ইত্যাদি। এগুলি নকশার বৈচিত্র্য আনে। কাঁথার এই ফোঁড়গুলি সাধারণত রান বা দোরে াগো সেলাই দিয়ে তৈরি হয়। তবে এখন শেডের কাজও দেখা যাচ্ছে। শীতের শুতে কাঁথার প্রয়োজন লক্ষ করা যায়। হেমন্ত কালেও কাঁথা ব্যবহৃত হয়। গরিব, ধনী, বর্ধিষ্ণু সব ঘরেই কাঁথার কদর আছে।

কাঁথার নকশাগুলোর মধ্যে পদ্ম ফুল, ফুলের চারপাশে লতাপাতা, জীবনবৃক্ষ, মানুষ, হাতি, ঘোড়া, রেলগাড়ি, নৌকা, পালকি, বিভিন্ন পশুপাখি, ঢেঁকি, জাঁতি, পান, ধানের ছড়া, দেবদেবীর চিত্র, শঙ্খ, সূর্য, মন্দির বা মসজিদের চূড়া, তাজিয়া, রথ, মিনার, গম্বুজ ও জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি দেখা যায়। কোনো কোনো কাঁথাতে রঙিন সুতোর নকশার ফাঁকা জায়গাতে নদীর ঢেউয়ের মতন ফোঁড় দেওয়া হয়।

নকশি কাঁথার ব্যবহার নানাভাবে আমাদের সমাজে সমাদৃত। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, লোকজ বিশ্বাস, শিক্ষা, বাণিজ্যিক, সামাজিক বিষয়ে এগুলি ব্যবহৃত হয়। অনেকসময় এই কাঁথা চাদর হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে নকশি কাঁথার প্রচলন বেশি। শুনেছি ফরিদপুর জেলায় মেয়েদের বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি য াবার সময় নকশি-কাঁথা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এখনও পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের বসতে দেওয়া হয় নকশি-কাঁথায়। এগুলি সামা জিক মর্যাদার প্রতীক। হিন্দু -মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই যৌথ অভিজ্ঞতার মানসিক প্রতিফলন ঘটে নকশি-কাঁথায়। নিয়াজ জামানের লেখা The Art of Kantha Embroidary (1993) বইটিতে লিখেছেন, কাঁথার মটিফকে একুশটি ভাগে এবং কাঁথার পাড় উনিশটি ভাগে বিভক্ত। জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নকশি-কাঁথাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় — মানুষ ও পশুপাখি, ফুল-লতাপাতা-বৃক্ষ ও জ্যামিতিক নকশা। ড. ওয়াকিল আহম্মদ, 'নকশি কাঁথার মটিফ বিচার (চ াকলা, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৪) প্রবন্ধে কাঁথার মটিফকে আটটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—পদ্মদল, কল্কা, সূর্য, সজীব গাছ, রথ-মসজিদ-তাজিয়া, তরঙ্গিত-পুষ্পিত লতা, টিয়া-ময়ূর-পায়রা এবং জ্যামিতিক নকশা। কিন্তু নকশি-কাঁথায় বিভিন্ন ধরনের মটিফের সন্ধান মেলে। যেমন—পদ্ম, সূর্য, চন্দ্র, চত্র, কলকা, জীবনবৃক্ষ, স্বস্তিকা, পদচিহ্ন, ঢেউ খেলানো পুষ্পলতা, পশুপাখি, মাছ, মন্দির-রথ, মসজিদ-মিনার গম্বুজ-তাজিয়া, নৌকা, পালকি, শঙ্খ, জ্যামিতিক নকশা।

নকশি-কাঁথায় পাড়ের ব্যবহারও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই পাড়ের নামও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে মূল নকশার সঙ্গে মান ানসই শাড়ির পাড় ও কাঁথার চারপাশে বর্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে কাঁথা শিল্পের চর্চার কথা জানা যায়। এই গ্রামগুলো হচ্ছে—মাণিকগঞ্জের মাইলাদি গ্রাম, ঢাকার কিছুটা দূরে সাভার গ্রাম, মুনশিগঞ্জের ফেগুনাসার গ্রাম, বগুড়ার বেতগাড়ি গ্রাম, ফরিদপুরের কুমড়া কান্দী-গ্রাম, ঝিকরগাছা, পাবনার বেড়া গ্রাম, রাজগাহীর বারোঘরিয়া গ্রাম ইত্যাদি। ঢাকা ও ময়মনসিংহে নকশি-কাঁথাকে 'ফুলের কাঁথা' ও বলা হয়। ফরিদপুরে নকশি- কাঁথার গ্রামীণ নাম 'সাজের কাঁথা'। বর্তমানে রাজশাহীতে কাঁথা সেলাইয়ে নানা ধরনের ত্রশ স্টিচ ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাঁথা শিল্পে অনেক বিষয় বস্তুর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ পুরাণের ডাকিনী-যোগিনীকে কাঁথা শিল্পে লাল সুতোর সেলাই দিয়ে স্বতন্ত্র করা হয়। এই লাল সুতো দেবী ছিন্নমস্তার ছিন্ন মস্তক থেকে ডাকিনী-যোগিনীর মুখে রক্তের প্রতীক চিহ্ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিমদের গাজী-পীরের কাহিনীতে পীর সাহেবের ব াঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবার বিবরণও চিত্রিত হয়েছে এই কাঁথা শিল্পে। অতীন্দ্রিয়বাদ অনেক কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে এই শিল্পে। সুতরাং দেখা যায় পৌরাণিক কা হিনী, লোককথা, লোকদৃশ্য—এ সবই কাঁথা শিল্পে প্রতিফলিত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কাঁথা শিল্প শুধুমাত্র শিল্পচর্চাই নয়, এর সঙ্গে গ্রামীণ নারীদের অর্থ আয়ের উৎস ও কর্মসংস্থান। দারিদ্র্য দূরীকরণে এই শিল্পের ভূমিকা অনেকখানি। আশা করব সরকার ও পঞ্চায়েতের সহায়তায় এই শিল্পচর্চা আরও প্রসারিত হবে। শিল্প নিপুণতার উৎকর্ষ বজায় রাখ াও অত্যন্ত জরি। একই সঙ্গে কাঁথা শিল্পের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বাংলা লোকশিল্পের দিক দিয়েও প্রয়োজন, সময়, বিষয় ও ইতিহাসকে জানার জন্য।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com